ত্রিপুরার নির্বাচন : একটি বিলম্বিত পর্যালোচনা

আলতাফ পারভেজ

এই লেখা যখন প্রকাশিত হবে, তখন বাংলাদেশের প্রতিবেশী ভারতের ত্রিপুরার নির্বাচনের প্রায় আড়াই মাস পূর্তি হবে। এ বছরের ১৬ ফেব্রুয়ারি এই নির্বাচন হয়েছিল এবং ৩ মার্চ এই নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। ইতোমধ্যেই দক্ষিণ এশিয়ায় এটা একটা 'বাসি সংবাদ'। কিন্তু কয়েকটি কারণে এই নির্বাচন এখনও আলোচনার দাবি রাখে বলেই এ লেখার অবতারণা।

ভৌগোলিকভাবে ত্রিপুরা এখন ভারতের অধীনস্থ এবং দেশটির তৃতীয় ক্ষুদ্রতম রাজ্য। ৫৪৫ আসনবিশিষ্ট ভারতীয় লোকসভায় ত্রিপুরার জন্য বরাদ্দ মাত্র দুটি আসন। তার মধ্যে একটি আবার 'শিডিউল ট্রাইব'দের জন্য সংরক্ষিত। ত্রিপুরায় ভোটারসংখ্যাও ২৫ লাখের কম। ভারতের বিশাল ভোটার জনমণ্ডলীর তুলনায় ত্রিপুরা প্রকৃতই নগণ্য।

এসব বিবেচনায় ত্রিপুরার 'স্থানীয়' নির্বাচন ভারতে 'জাতীয়ভাবে' মনোযোগ পাওয়ার সামান্যই কারণ ছিল। কিন্তু বাস্তবে ঘটেছে উল্টোটি। ত্রিপুরার নির্বাচনী ফলাফলকে ঘিরে ভারতজুড়ে এক অভূতপূর্ব দক্ষিণপন্থী উল্লাসের ঢেউ বয়ে যায়, যার রেশ পড়ে বাংলাদেশেও। প্রভাবশালী প্রচারমাধ্যমগুলো ভারতে এবং বাংলাদেশেও বলার চেষ্টা করেছে, ত্রিপুরার নির্বাচনের ফলাফল ছিল বামপন্থার বিরুদ্ধে এক সুস্পষ্ট জনরায়। অনেকে আরও আগ বাড়িয়ে এটাকে দেখাতে চাইছিলেন উপমহাদেশের সর্বশেষ কমিউনিস্ট ঘাঁটির পরাজয় তথা সাম্যবাদী চিন্তার প্রত্যাখ্যান হিসেবে। বর্তমান লেখায় এই প্রচারণার সত্যাসত্য ছাড়াও পূর্বাপর পরিস্থিতি সংক্ষিপ্তাকারে খতিয়ে দেখা হয়েছে।

ত্রিপুরার নির্বাচনী রাজনীতির অতীত

ভারতের কেন্দ্রে যারা ক্ষমতায় রয়েছে সেই সংঘ পরিবার যে তিন শক্তিকে (মুসলমান, খ্রিস্টান ও কমিউনিস্ট) 'অফিসিয়ালি' ভাবাদর্শিকভাবে শত্রু মনে করে গত প্রায় ৭০ বছর ধরে ত্রিপুরায় তাদের প্রায় একচেটিয়া প্রভাব রয়েছে। বিজেপির জন্য এটা এক অসহ্য পরিস্থিতি ছিল। ১৯৫২ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত লোকসভা নির্বাচনগুলোর মধ্যে ত্রিপুরার একটি আসনে চারবার এবং অপর আসনে তিনবার মাত্র অ-কমিউনিস্টরা জিতেছে।

স্থানীয় বিধানসভার ইতিহাস আরও বেশি কমিউনিস্ট প্রভাবিত। ১৯৬৩ থেকে এ পর্যন্ত ১৩টি নির্বাচনে আটবার সিপিএম (কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদী) রাজ্যের নির্বাচনে জিতেছে। এর মধ্যে গত ৩৪ বছর তারা একচেটিয়া জিতে চলেছে। সর্বশেষ মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার ২০ বছর ধরে এই পদে আসীন ছিলেন। এছাড়া ৬০ আসনের ত্রিপুরা বিধানসভায় ২০১৮ সালের পূর্বে আরএসএস পরিবারের হিন্দুত্ববাদী কোন দলের প্রার্থী জেতেননি।

এই রকম বিরূপ অতীতের ওপর দাঁড়িয়ে ২০১৪ সালে কেন্দ্রে ক্ষমতায় এসেই যেসব রাজ্যে বিজেপি পরিবার বিশেষ সাংগঠনিক মনোযোগ দিয়েছিল তার মধ্যে ছিল ত্রিপুরাও। এর কারণটি যতটা রাজনৈতিক, তার চেয়েও বেশি ছিল আদর্শগত। বিজেপির এইরূপ মনোভাব দেখেই দিলির প্রচারমাধ্যমগুলো বহুকাল আগে থেকে ত্রিপুরার নির্বাচনকে অভিহিত করছিল 'ওয়াটারলুর যুদ্ধ'। অর্থাৎ বিজেপি ছোট্ট এই রাজ্যের নির্বাচনকে জীবন-মরণ যুদ্ধে পরিণত করে ফেলেছিল। স্বভাবত বামফ্রন্টও তা-ই করেছিল। এইরূপ হাড্ডাহাড্ডির প্রথম ফল হয়েছে একটা রেকর্ড। ভোটারদের মধ্যে ৯২ শতাংশ (পোস্টাল ব্যালটসহ) এই নির্বাচনে ভোট দিয়েছে এবং এবার নিয়ে তৃতীয়বার ত্রিপুরায় ৯০ শতাংশের বেশি ভোটার টার্ন-আউট হল, যা ভারতের ইতিহাসে একটা রেকর্ড।

ত্রিপুরায় ভোটারদের বেশি বেশি কেন্দ্রে আসার একটা বড় কারণ হল, ট্রাইবাল-বাঙালি সবাই এই রাজ্যে ভীষণ রকমে রাজনীতি সচেতন। বস্তুত ১৯৯০-পরবর্তী সময়ে বিশ্বজুড়ে কমিউনিস্টদের দুর্দিনেও তাই ত্রিপুরা থেকে তাদের হটানো যায়নি। যেমনটি ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গে ও কেরালায়। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএম তৃণমূলের কাছে নির্দয়ভাবে হেরেছে, আর কেরালায় মাঝে মাঝেই কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে তাকে রাজনৈতিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হচ্ছে।

অতীতে ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট জিতলেও মূলত লড়াই হত তাদের সঙ্গে কংগ্রেসের। এবার লড়াইয়ের বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে মাঠে আবির্ভূত হয় বিজেপি। তারা জোট করে স্থানীয় 'ইন্ডিজেনাস পিপলস ফ্রন্ট অব ত্রিপুরা'র (আইপিএফটি) সঙ্গে এবং কংগ্রেসের স্থান দখল করে বামফ্রন্টকে চ্যালেঞ্জ ছোড়ে। তবে ডান ও বামের সরাসরি লড়াইয়ে কংগ্রেস এবার আসলে কী ভূমিকা নিয়েছিল সেটা একটু পরেই আমরা দেখতে পাব এবং ভারতের রাজনীতি সম্পর্কে বাংলাদেশ থেকে বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে তা একটা গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেবে বলে ধরে নেয়া যায়।

> মনোনয়নপত্র জমার সময় আয়-রোজগারের যে বিবরণ মানিক সরকার দিয়েছেন তাতে দেখা যায়, ৬৯ বছর বয়সী মানিক সরকারের ব্যাংক হিসাবে এই মুহূর্তে মাত্র ২,৪১০ রুপি আছে উত্তোলনযোগ্য। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পাওয়া বেতন ছাড়াও পার্টিকে তিনি পারিবারিক সূত্রে পাওয়া সম্পদের অনেকখানিই দিয়ে দিয়েছেন বহুকাল আগেই।

সাম্যবাদ নয়, মূল ইস্যু ছিল ট্রাইবাল-বাঙালি বিভেদরেখা

ত্রিপুরার নির্বাচনী প্রচারণাকে বিজেপি কতটা সিরিয়াসলি নিয়েছিল সেটা প্রচারণায় তাদের 'তারকা-সমাবেশ' থেকে স্পষ্ট ছিল। মোদি থেকে শুরু করে উত্তর প্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ পর্যন্ত সকলেই এখানে প্রচারযুদ্ধে শামিল হয়েছিলেন দীর্ঘ সময় ধরে। প্রধানমন্ত্রী মোদি একাধিকবার এসেছেন প্রচারণায় শামিল হতে। তাঁর পরিষদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী–কেউই নির্বাচনী যুদ্ধে স্থানীয় বিজেপিকে মদদ দিতে সফর করে যেতে ভুল করেননি।

বামদের পক্ষে মানিক সরকার নিজেই তাঁর টিমকে নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন। স্বল্প সময়ের জন্য সিতারাম ইয়েচুরি ও প্রকাশ কারাতও এসেছিলেন, কিন্তু ভোটের যুদ্ধে এঁদের আগমন-নির্গমন বিশেষ কোন তাৎপর্য বহন করেনি। ক্ষমতায় থাকাকালীন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তির বাইরে মানিক সরকারের ইমেজই স্থানীয় বাম কর্মীদের ভরসা ছিল। দক্ষিণ এশিয়ার দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিতে মানিক সরকার প্রকৃতই

এক দারুণ ব্যতিক্রম। অর্থবিত্তে তাঁর অনাগ্রহ তাঁকে ভারতীয় রাজনীতিতে ব্যক্তি হিসেবে সমালোচনার অযোগ্য করে রেখেছে। এবারের নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমার সময় আয়-রোজগারের যে বিবরণ মানিক সরকার দিয়েছেন তাতে দেখা যায়, ৬৯ বছর বয়সী মানিক সরকারের ব্যাংক হিসাবে এই মুহূর্তে মাত্র ২,৪১০ রুপি আছে উত্তোলনযোগ্য। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পাওয়া বেতন ছাড়াও পার্টিকে তিনি পারিবারিক সূত্রে পাওয়া সম্পদের অনেকখানিই দিয়ে দিয়েছেন বহুকাল আগেই। এখন তাঁর আয় হল পার্টির কাছ থেকে পূর্ণ সময়ের কর্মী হিসেবে পাওয়া মাসিক ৫ হাজার রুপি ভাতা। সর্বমোট ২৬ লাখ রুপির স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি আছে তাঁর। ভারতের একটি রাজ্যে আড়াই দশক একনাগাড়ে মুখ্যমন্ত্রী থাকার পরও সর্বশেষ এক জরিপে দেখা গেছে, তিনি সমকালীন ২৯ জন মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে সম্পদে সবচেয়ে দরিদ্র ছিলেন!

স্বভাবত এইরূপ রাজনীতিবিদরা এখন উপমহাদেশের বিরল এক প্রজাতি। তবে ভোটারদের কাছে অন্যান্য জরুরি সামাজিক ইস্যুর চেয়ে মানিক সরকারের ব্যক্তিগত সততা অধিক মূল্যবান ছিল না। জরুরি সেই ইস্যুটি হল ত্রিপুরার জাতিগত বিভেদরেখা। দীর্ঘ জনকল্যাণমূলক শাসনেও যা বিলীন হয়নি। এককালের ট্রাইবাল অধ্যুষিত জনপদ ত্রিপুরায় এখন বাঙালিদের সংখ্যাই বেশি। স্বভাবত ট্রাইবালরা মনে করে, তারা বাঙালিদের আধিপত্যের শিকার। এই বোধ থেকেই একসময় সেখানে স্বাধীনতার দাবি জনপ্রিয় ছিল এবং এখন দাবিটি কিছুটা সংকুচিত হয়ে পৃথক একটি রাজ্যের দাবিতে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ স্থানীয় ট্রাইবালরা চাইছে ত্রিপুরার আদিবাসীপ্রধান অঞ্চল নিয়ে (যা রাজ্যের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ এলাকা) 'টিপরাল্যান্ড' নামে একটি রাজ্য গঠিত হোক।

আমরা অনেকেই হয়তো জানি, ব্রিটিশ শাসনামলে ত্রিপুরা ছিল প্রিন্সলি স্টেট অর্থাৎ 'স্বাধীন রাজ্য'। ত্রিপুরা ভারতভুক্ত হয়েছে ভারত ভাগের দুই বছরের বেশি সময় পর, ১৯৪৯ সালের ১৫ অক্টোবর। স্বাধীন একটি জনপদের স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলার পরবর্তী অধ্যায় ত্রিপুরায় ছিল স্বাভাবিকের চেয়ে অধিক বেদনাময়। ১৯৪১ সালে প্রিন্সলি স্টেট ত্রিপুরার ৫ লাখ জনসংখ্যার ৫৩ শতাংশ ছিল ট্রাইবাল। আট দশক শেষে ওই ট্রাইবালরা নিজ বাসভূমে এখন মাত্র ৩০ শতাংশের মত।

বরাবরই দেববর্মাসহ ত্রিপুরার প্রায় ১৮টি স্থানীয় জাতিসত্তা ক্ষমতার ওই ভারসাম্যের বিরুদ্ধে লড়েছে কখনও সশস্ত্রভাবে, কখনও ভোটের সমীকরণে। ১৯৭৭-এর পর থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত বামফ্রন্ট দীর্ঘ ৪০ বছরে একবারই কংগ্রেসের কাছে ক্ষমতা হারিয়েছিল–যেবার কংগ্রেস ট্রাইবাল দল 'ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমাজের' সঙ্গে জোট করে। পুরো রাজ্যে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি ও সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে ট্রাইবালদের জন্য প্রায় ৩১ শতাংশ কোটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে সিপিএম। কিন্তু রাজ্যজুড়ে বাঙালিত্বের যে জয়জয়কার, ট্রাইবালদের মনোজগৎ দখল করেছিল সেটাই।

মোদি এবং বিজেপি ত্রিপুরার জনজীবনের ট্রাইবাল-বাঙালি বিভেদরেখাটি জানত। সেটাকে তারা এই নির্বাচনে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে। যে সংগঠনটি টিপরাল্যান্ডের আন্দোলনে চ্যাম্পিয়ন, সেই ট্রাইবাল ফ্রন্টের (আইপিএফটি) সঙ্গেই বিজেপি জোট করে। ত্রিপুরা ভেঙে আরেকটি পৃথক রাজ্য গড়ার দাবি বিজেপি প্রয়োজনে বিবেচনা করবে–নীরব এই আশ্বাস নানাভাবে তুলে ধরা হয়। বামফ্রন্টকর্মীরা এইরূপ প্রস্তাবের বিরোধী হলেও স্থানীয় ট্রাইবালদের কাছে এটা এক বড় লোভনীয় সম্ভাবনা হিসেবে আবির্ভূত হয়। পর্যবেক্ষকদের মতে, ত্রিপুরাসহ উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলোর স্বাধীনতাসংগ্রামকে দুর্বল করার এটাও একটা ভাল কৌশল–জনপদগুলোকে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলা। সংঘ পরিবার এক্ষেত্রে এক ঢিলে দুই পাখি মারার কৌশল নেয় এবং সফল হয়। তবে কেবল ট্রাইবাল ভোটে বিজেপির পক্ষে নির্বাচনে জেতা সম্ভব ছিল না। সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে দিয়েছে ত্রিপুরার কংগ্রেস সংগঠকরা।

যদিও ট্রাইবালদের আবেগকে সমর্থন দেয়ায় ৩৭ শতাংশ ট্রাইবাল ভোট এবার কোনরূপ বিভক্ত হয়নি। অনুসন্ধানে দেখা যায়, ট্রাইবালদের জন্য সংরক্ষিত ২০টি আসনেই বামফ্রন্ট সবচেয়ে খারাপ করেছে।

গত সাত-আট দশকে ত্রিপুরায় ট্রাইবালদের জন্য বামফ্রন্ট অনেক উন্নয়নধর্মী কাজ করলেও বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের শাসন মানেই ছিল রাজ্যে বাঙালির শাসন। ট্রাইবাল তরুণরা তথাকথিত উন্নয়নের চেয়েও ত্রিপুরার ক্ষমতা কাঠামোয় দেখতে চাইছিল নিজেদের সংস্কৃতির মানুষকে। এটা তাদের ১৯৪৯ সালে হারিয়ে ফেলা স্বাধীনতার এক ধরনের সামান্য সুরাহা হিসেবে দেখছিল তারা এবং তা-ই হয়েছে শেষ পর্যন্ত। নির্বাচনে বিজেপির জোটসঙ্গী হয়ে আইপিএফটির ৯ প্রার্থীর আটজনই জিতেছেন। এর মধ্য দিয়ে তারা এই প্রথম ভোটের ফলে নিজেদের নির্ধারক ভূমিকায় দেখতে পেল। ওই ফলের প্রতীকী বার্তাটি তাই পরিষ্কার : বাঙালিত্বের আধিপত্য অন্তত প্রতীকী-ভাবে হলেও আপাতত পরাজিত হল ত্রিপুরায়। ত্রিপুরার নির্বাচনে লড়াই হয়েছিল অবদমিত ট্রাইবাল আবেগের সঙ্গে অধিপতি বাঙালিত্বের। এটাকে সাম্যবাদ বনাম পুঁজিতন্ত্রের লড়াই আকারে দেখালে ভোটযুদ্ধের মূল মর্মটুকু বিকৃত করা হয় মাত্র।

ত্রিপুরার নির্বাচনে লড়াই হয়েছিল অবদমিত ট্রাইবাল আবেগের সঙ্গে অধিপতি বাঙালিত্বের। এটাকে সাম্যবাদ বনাম পুঁজিতন্ত্রের লড়াই আকারে দেখালে ভোটযুদ্ধের মূল মর্মটুকু বিকৃত করা হয় মাত্র।

তবে এটাই বিজেপির বিজয়ের জন্য যথেষ্ট ছিল না। নির্বাচনের মূল চমক ছিল এই নির্বাচনে বিজেপির পক্ষে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অংশ নেয়া। বিস্ময়কর হলেও সত্য, কংগ্রেস সমর্থকরা তাদের পুরো ভোট তুলে দেয় বিজেপি জোটের প্রতীকে। যার ফল হিসেবে গান্ধীদের কংগ্রেস ত্রিপুরায় একটি আসনও পায়নি। কিভাবে কংগ্রেস এটা করেছে সেই বিষয়ই এই লেখার শেষাংশে তথ্য-প্রমাণসহ তুলে ধরা হয়েছে, তবে তার আগে বলে নেয়া দরকার যে কংগ্রেস কেন বিজেপিকে ভোট দিয়েছে।

রাজ্যে ত্রিশ বছর বিরোধী দলে থেকে কংগ্রেস ছিল ক্লান্ত

বিজেপি এটা জানত, ত্রিপুরায় বামফ্রন্টকে কোণঠাসা করতে কংগ্রেসকে প্রয়োজন। কিন্তু জাতীয় রাজনীতির সমীকরণের কারণে সেটা সম্ভব ছিল না। সে জন্য নির্বাচনের সম্ভাব্য ত্রিমুখী চরিত্র বন্ধ করতে সংঘ পরিবার গত দুই বছর কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ অনেক নেতাকেই তাদের ঘরে নিয়ে এসেছিল। এর মধ্য দিয়ে বাঙালি ভোটারদের মধ্যে বহু দশক ধরে যারা পারিবারিকভাবে কংগ্রেসের সমর্থক ছিল তারা নির্বাচনের আগেই বিজেপি ক্যাম্পে চলে আসে। ত্রিপুরায় কংগ্রেসপন্থী বাঙালিদের মধ্যে অনেকেই ছিল অতীতের অভিবাসী। সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থান ধরে রাখতে ওইসব মানুষ জাতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থানের বার্তাটি ভালভাবে আত্মস্থ করেছিল এবং আবারও রাজ্যে বামফ্রন্টকে ক্ষমতায় দেখার

ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিল না। গত ৩০ বছর ত্রিপুরায় বিরোধী দলে থাকতে থাকতে পুরনো কংগ্রেসিরা ক্লান্ত ছিল। এছাড়া তারা দেখছিল জাতীয় নির্বাচনে আগামীতে আবারও বামদের সঙ্গে কংগ্রেসের জোট গঠনের সম্ভাবনা রয়েছে, যা তাদের আতঙ্কিত করেছে ওই রাজ্যে নিজেদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে। তাই সিপিএমবিরোধী প্ল্যাটফর্ম হিসেবে তারা বিজেপিকে বেছে নিয়েছে ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অবস্থান রক্ষা করতে।

অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন, এর আগের নির্বাচনগুলোতে এমনটি ঘটেনি কেন? উত্তরটি পরিষ্কার। স্বাধীনতার পর থেকে ত্রিপুরায় যত নির্বাচন হয়েছে এতে বামফ্রন্টের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল কংগ্রেস। উভয়ে ছিল বাঙালি প্রভাবিত। এর মধ্যে ট্রাইবালদের একাংশ নিজেদের প্রতিনিধিকে ভোট দিত। অপরাংশ কংগ্রেস ও সিপিএমের মধ্যে তাদের প্রতি নমনীয় প্রার্থীকে বাছাই করত। ত্রিমুখী ওই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বামফ্রন্ট সাংগঠনিক শক্তি ও সুশাসনের জোরে বেরিয়ে এসেছে বার বার। বিজেপি এবার ত্রিমুখী সেই লড়াইয়ের পথ বন্ধ করতে আগে থেকেই কেন্দ্রীয় ক্ষমতার জোরে সকল উপায়ে ছিল তৎপর। কংগ্রেসের অনেক নেতাকে নির্বাচনের পূর্বেই তারা দলভুক্ত করেছিল অর্থবিত্ত-ক্ষমতার নানা সমীকরণে। তবে নেতাদের নিলেই ভোটব্যাংক নেয়া যায় না। ভোটব্যাংক বিজেপিমুখী হয়েছে মুখ্যত আবারও রাজ্য পর্যায়ে দ্বিতীয় বা তৃতীয় অবস্থানে থাকার ভীতি থেকে এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কংগ্রেস হাইকমান্ডের মানিক সরকার বিরোধী তীব্র বিদ্বেষ।

ভারতীয় রাজনীতি সম্পর্কে যাঁরা খোঁজ রাখেন তাঁরা হয়তো জানেন, মোদি ঢেউয়ের মুখে কংগ্রেস এই মুহূর্তে জাতীয়ভাবে চরম সংকটে রয়েছে সেখানে। ফলে তারা ২০১৯-২০ এর নির্বাচনী মৌসুমে সিপিএমকে সঙ্গে পেতে আগ্রহী। সিপিএমের একাংশও এইরূপ জোটের পক্ষে। কিন্তু শেষোক্ত দলে যারা কংগ্রেসের সঙ্গে জোট গঠনের বিপক্ষে তাদের অন্যতম নেতা মানিক সরকার। ফলে ত্রিপুরায় মানিক সরকারের নেতৃত্বে সিপিএমের আরেক দফা বিজয় সিপিএমে সেই 'লাইন'-এর অবস্থান শক্তিশালী হয়ে উঠত, যারা মনে করে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করা সঠিক হবে না। মানিক সরকারকে নিয়ে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এইরূপ ভীতি ও বিদ্বেষও ত্রিপুরার নির্বাচনে কংগ্রেসের বিজেপিকে ভোট ছেড়ে দেয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হতে পারে বলে অনুমান করা হয়।

> ত্রিপুরার নির্বাচনী এসব পরিসংখ্যানের পুরোটাই নেয়া হয়েছে ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের ডেটা ব্যাংক থেকে। এসব পরিসংখ্যান স্পষ্ট সাক্ষ্য দিচ্ছে, ত্রিপুরায় বিজেপির বিজয়ের মূল ভিত্তি গড়ে দিয়েছে কংগ্রেস। অথচ জাতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেস নিজেকে যে কোন মূল্যে হিন্দুত্ববাদ ও মৌলবাদ বিরোধী সংগ্রামের চ্যাম্পিয়ন শক্তি হিসেবে তুলে ধরতে বদ্ধপরিকর। আর কংগ্রেসের এই চেষ্টার পরিণতিতে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক রাজনীতিতেও তার রয়েছে ভিন্ন এক ভাবমূর্তি। কিন্তু ত্রিপুরার নির্বাচনী পরিসংখ্যান বলছে, ভারতের কংগ্রেস সমর্থকদের মৌলবাদ ও হিন্দুত্ববাদ বিরোধী অঙ্গীকারের আদর্শিক ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল।

ভোটের দিন আসলে কী ঘটেছিল : পরিসংখ্যানগত প্রমাণ

অনেকেই জানেন, ভারতে সাধারণভাবে পাঁচ বছর পর পর রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন হয়। ত্রিপুরায় ২০১৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ভোট পেয়েছিল প্রদত্ত ভোটের ৩৭ শতাংশ (৮ লাখ ৪ হাজার)।

২০০৮ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস ভোট পায় প্রদত্ত ভোটের ৩৬.৩৮ শতাংশ (৬ লাখ ৮৪ হাজার)।

এ দুই নির্বাচনী ফল থেকে এটা স্পষ্ট, ত্রিপুরায় কংগ্রেসের মোটামুটিভাবে ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ ভোট ভিত্তি রয়েছে। কিন্তু কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য হল এবারের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস পেয়েছে প্রদত্ত ভোটের ১.৮ শতাংশ মাত্র (৪১ হাজার ভোট)।

স্বভাবত প্রশ্ন উঠেছে, হঠাৎ রাতারাতি এই রাজ্যে কংগ্রেসের ভোটব্যাংক কোথায় উধাও হল। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে আমাদের যেতে হবে বিজেপির ভোটের পরিসংখ্যানে।

যদিও ত্রিপুরায় ২০১৮-এর আগে হিন্দুত্ববাদী বিজেপির কোন প্রার্থী কখনও জেতেনি, কিন্তু বহুকাল ধরেই তারা সেখানে নির্বাচন করে যাচ্ছে। ২০০৮-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি মনোনীত প্রার্থীরা পায় প্রদত্ত ভোটের ১.৪৯ শতাংশ (২৮ হাজার ভোট)।

২০১৩ সালের নির্বাচনে একই দল পায় ১.৫ শতাংশ ভোট (৩৩ হাজার ৮০৮)। অর্থাৎ রাজ্যে দলটির ভোটব্যাংক এক লাখের নিচে ছিল বরাবর। কিন্তু ২০১৮ সালের সর্বশেষ নির্বাচনে তারা পেল প্রায় ৪৩ শতাংশ ভোট (১০ লাখ)!

অর্থাৎ বিজেপির ভোট যখন ত্রিপুরায় এক লাখ থেকে ১০ লাখে উঠছে (এর মাঝে কিছু ভোট রয়েছে ট্রাইবালদের), ঠিক তখনই কংগ্রেসের ভোট ৭-৮ লাখ থেকে ৪১ হাজারে নেমে আসছে। এ দুই দলের ভোটের এই অবিশ্বাস্য উত্থান-পতনের রহস্যটি অনুমান করা কঠিন নয়। তবে পাঠককে সেই অনুমানে সাহায্য করার জন্য আমরা পরিসংখ্যানের আরও মাইক্রো চিত্র বিশ্লেষণে যাব, যাতে উল্লিখিত রহস্যটি একেবারেই রহস্যমুক্ত হয়ে যাবে।

ত্রিপুরায় এবার যে ৫৯টি বিধানসভা আসনে ভোট হয়েছে তার একটি হল পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বামুতিয়া আসন।

২০০৮ সালের নির্বাচনে এই আসনে কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (মার্ক্সবাদী) বা সিপিএমের প্রার্থী ছিলেন হরিচরণ সরকার। তিনি ভোট পান ১৭ হাজার ৩২৪। আর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের প্রকাশ চরণ দাস ভোট পান ১৪ হাজার ৯৪৪। সিপিএম প্রার্থী জেতেন ২ দুই হাজার ৪০০ ভোটে।

একই আসনে ২০১৩ সালের ভোটে সিপিএম প্রার্থী ছিলেন যথারীতি হরিচরণ। আর কংগ্রেসেরও প্রার্থী ছিলেন যথারীতি প্রকাশ চরণ। এবারও হরিচরণ জেতেন। তিনি ভোট পান ১৯ হাজার ৭৪৪। আর কংগ্রেসের প্রকাশ চরণ পান ১৬ হাজার ৯৯৪। লক্ষণীয় যে কংগ্রেসের যে নির্দিষ্ট দৃঢ় ভোটব্যাংক রয়েছে তা স্পষ্ট।

কিন্তু ২০১৮ সালের নির্বাচনে দেখা যায়, সিপিএমের হরিচরণ দাসের ১৯ হাজার ৪২ ভোটের বিপরীতে কংগ্রেসের স্বপনানন্দ দাস পেয়েছেন মাত্র ৪০২ ভোট। কিন্তু বিজেপির কৃষ্ণচন্দ্র দাস পেয়েছেন ২০ হাজার ১৪ ভোট। অবিশ্বাস্য এক ব্যাপার। অর্থাৎ সিপিএমের ভোটব্যাংক এই আসনে অক্ষুন্নই ছিল। কেবল কংগ্রেসের ভোটগুলো প্রায় পুরোটাই গিয়ে বিজেপির মার্কায় পড়েছে।

বামুতিয়ার কেসস্টাডিটি আমরা দৈবচয়ন আকারেই নিয়েছিলাম এবং বামুতিয়ার এই চিত্র ত্রিপুরার কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না এবার।

আগরতলার খয়েরপুর আসনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। সেখানে এবার বিজেপির রতন চক্রবর্তী পেয়েছেন ২৫ হাজার ৪৯৬ ভোট (প্রদত্ত ভোটের ৫৭ শতাংশ)। কংগ্রেসের সুখময় সাহা পেয়েছেন ৪৮২ ভোট (প্রদত্ত ভোটের ১ শতাংশ!)। আর সিপিএম পেয়েছে ১৮ হাজার ৪৫৭ ভোট (প্রদত্ত ভোটের ৪১ শতাংশ)।

এই একই আসনে গত নির্বাচনে কংগ্রেস ভোট পেয়েছিল ১৯ হাজার ৬৭৫ এবং বিজেপি পেয়েছিল ৬৯৮ ভোট। লক্ষণীয়, সিপিএমের ভোট প্রায় অপরিবর্তিতই আছে (২০ হাজার ৯৭২)। কিন্তু কংগ্রেসের পুরো ভোট বিজেপির দিকে গেছে।

ত্রিপুরার নির্বাচনী এসব পরিসংখ্যানের পুরোটাই নেয়া হয়েছে ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের ডেটা ব্যাংক থেকে। এসব পরিসংখ্যান স্পষ্ট সাক্ষ্য দিচ্ছে, ত্রিপুরায় বিজেপির বিজয়ের মূল ভিত্তি গড়ে দিয়েছে কংগ্রেস। অথচ জাতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেস নিজেকে যে কোন মূল্যে হিন্দুত্ববাদ ও মৌলবাদ বিরোধী সংগ্রামের চ্যাম্পিয়ন শক্তি হিসেবে তুলে ধরতে বদ্ধপরিকর। আর কংগ্রেসের এই চেষ্টার পরিণতিতে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক রাজনীতিতেও তার রয়েছে ভিন্ন এক ভাবমূর্তি। কিন্তু ত্রিপুরার নির্বাচনী পরিসংখ্যান বলছে, ভারতের কংগ্রেস সমর্থকদের মৌলবাদ ও হিন্দুত্ববাদ বিরোধী অঙ্গীকারের আদর্শিক ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল।

পাশাপাশি উপরোক্ত পরিসংখ্যান এও বলছে, ভারতীয় প্রভাবশালী মিডিয়াগুলো যেভাবে প্রচার করছে যে কর্মসংস্থান সংকটের কারণে এবং বামপন্থার বিরোধিতা থেকে দলে দলে সিপিএম সমর্থক তরুণরা বিজেপিকে ভোট দিয়েছে, তা-ও মূল সত্যকে আড়াল করছে মাত্র। সিপিএম এবারের এই ভূমিধসেও যে আসনগুলো রক্ষা করতে পেরেছে সবগুলো প্রান্তিক গরিব এলাকা নিয়ে গঠিত নির্বাচনী আসন। এছাড়া প্রদত্ত ভোটে সিপিএমের গড় হিস্যা মাত্র ৪ শতাংশ কমেছে এবং ওপরে বামুতিয়া ও খয়েরপুরের যে কেসস্টাডি তুলে ধরা হয়েছে তাতে সিপিএমের ভোট পূর্বের তুলনায় প্রায় অপরিবর্তিত থাকতেই দেখা গেছে।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সম্পর্কে দক্ষিণ এশিয়াজুড়ে একটা ধারণা রয়েছে যে দলটির সাংগঠনিক নেতৃত্ব ও সমর্থক ভিত্তি সেক্যুলার ধাঁচের এবং বিজেপির হিন্দুত্ববাদের রাজনীতির বিপক্ষে এটাই ভারতবাসী (এবং দক্ষিণ এশিয়ারও) ভরসা। ভারতের প্রগতিশীল সমাজের একাংশ বরাবরই এই ধারণার বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করে থাকে। কিন্তু তাতে দক্ষিণ এশিয়াজুড়ে কংগ্রেসের সেই ইমেজের ব্যত্যয় ঘটেনি। ত্রিপুরার নির্বাচনী পরিসংখ্যান কংগ্রেসের সেই ঐতিহাসিক সেক্যুলার আবেদন ও ইমেজকে মোটাদাগে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে নিঃসন্দেহে।

আলতাফ পারভেজ: দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস বিষয়ের গবেষক।
ইমেইল: altafparvez@yahoo.com

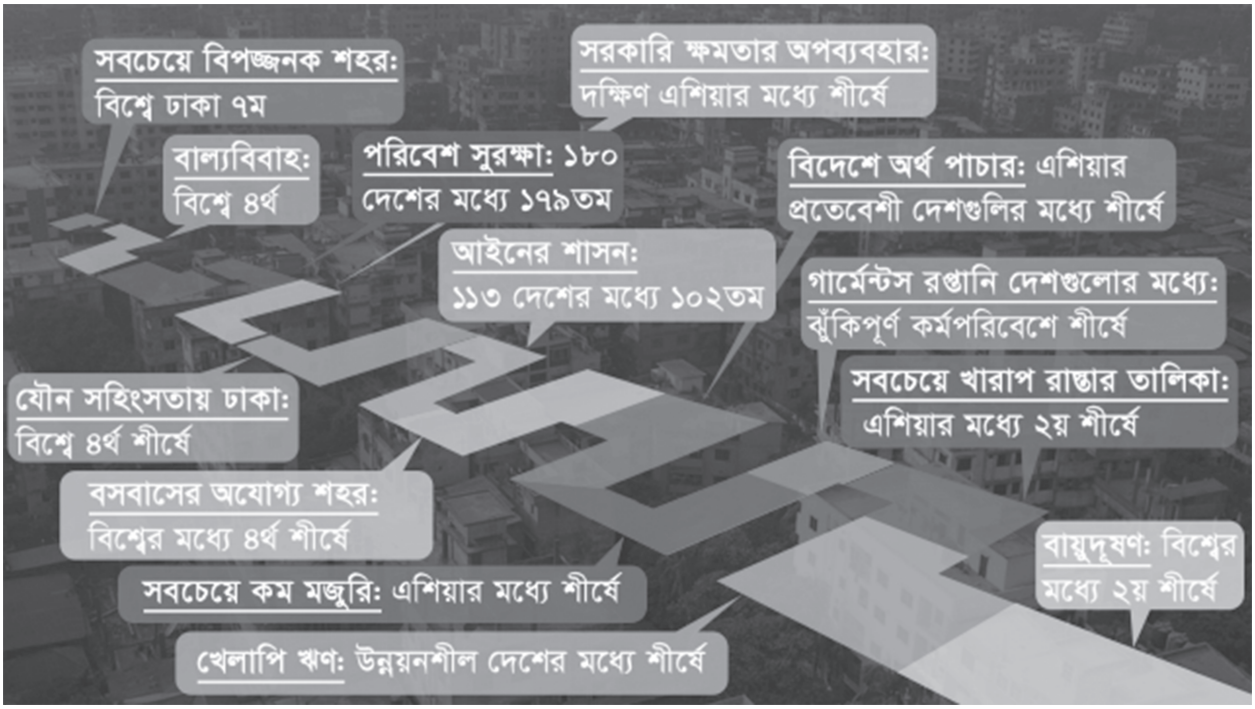

সূত্র: প্রথম আলো, ০২ এপ্রিল ২০১৮